হজ উমরা ও যিয়ারত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় : হজের সময় দো‘আ করার সুযোগ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

মাবরূর হজ

‘মাবরূর অর্থ মকবুল। মাবরূর হজ অর্থ মকবুল হজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

‘আর মাবরূর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।’[1] তাই আমাদের হজ মাবরূর বা মকবুল হওয়ার জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

বৈধ উপার্জন

হজের সফর দো‘আ কবুলের সফর। তারপরও যদি হারাম মাল দিয়ে তা করে তবে তা কবুল না হওয়ার বিষয়টি এসেই যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: 51] وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟»

‘হে মানুষগণ, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যার নির্দেশ পয়গম্বরদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর।’ (সূরা মু’মিনূন ৫১ আয়াত) তিনি আরও বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক।’’ (সূরা বাকারাহ ১৭২ আয়াত)

অতঃপর তিনি সেই লোকের কথা উল্লেখ করে বললেন, যে এলোমেলো চুলে, ধূলামলিন পায়ে সুদীর্ঘ সফরে থেকে আকাশ পানে দু’ হাত তুলে ‘ইয়া রবব্! ‘ইয়া রবব্!’ বলে দো‘আ করে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়েই তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। তবে তার দো‘আ কিভাবে কবুল করা হবে?’’ ’[2]

লোক দেখানো কিংবা সুনাম কুড়ানোর মানসিকতা বর্জন

আনাস ইবন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اَللّٰهُمَّ حَجَّةً لاَ رِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةَ».

‘হে আল্লাহ, এমন হজের তাওফীক দান করুন, যা হবে লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানোর মানসিকতা মুক্ত।’[3]

আহার করানো ও ভালো কথা বলা

জাবের ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ কাজ হজকে মাবরূর করে? তিনি বললেন,

«إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلَامِ».

‘আহার করানো এবং ভালো ও সুন্দর কথা বলা।’[4] খাল্লাদ ইবন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবন যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ হাজী উত্তম? তিনি বললেন, যে আহার করায় এবং তার জিহবাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি বলেন, আমাকে ছাওরী বলেছেন, আমরা শুনেছি, এটিই মাবরূর হজ।’[5]

সালাম বিনিময়

জাবের ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সা. কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ কাজের দ্বারা হজ মাবরূর হয়? তিনি বললেন,

«إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ».

‘খাবার খাওয়ানো এবং বেশি বেশি সালাম বিনিময়ের দ্বারা।’[6]

তালবিয়া পাঠ ও কুরবানী করা

আবূ বকর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, হজে কোন্ কাজে সওয়াব বেশি? তিনি বললেন, الْعَجُّ وَالثَّجُّ ‘উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া এবং জন্তুর রক্ত প্রবাহিত করা।’[7]

সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করা

আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘হজের মধ্যে সবচে’ পুণ্যময় কাজ খাবার খাওয়ানো এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করা।’[8]

ধৈর্য, তাকওয়া ও সদাচার

ছাওর ইবন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে এই কা‘বা ঘরের ইচ্ছা করল অথচ তার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য নেই, তার হজ নিরাপদ নয়। ধৈর্য, যা দিয়ে সে তার মূর্খতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে; তাকওয়া, যা তাকে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং সঙ্গী-সাথির সাথে সদাচার।’[9]

দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ এবং আখিরাতে আগ্রহ

এক ব্যক্তি হাসান বসরীকে বললেন, হে আবূ সাঈদ, মাবরূর হজ কোন্টি? তিনি বললেন, ‘যে হজ দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী এবং আখিরাতে আগ্রহী বানায়।’[10]

হজের আগের অবস্থা থেকে পরের অবস্থার উন্নতি

একজন হাজী যখন হজের সফরে বের হবেন। পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করবেন। তারপর হজ সম্পন্ন করে নিজ দেশে ফিরে আসবেন, তখন আমরা তাকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারব তার অবস্থার উন্নতি হয়েছ কি-না? যদি অন্যের সাথে আচার-আচরণ, লেনদেন, আমানতদারী, অন্যের হক আদায় এবং ইবাদতের ওপর অবিচলতায় তার অবস্থার উন্নতি হয়, তবে বুঝতে হবে, তার হজ মাবরূর হয়েছে।’

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাবরূর হজের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ, মাবরূর হজ দুই পন্থায় হয়। এক. মানুষের সাথে সদাচার। দুই. হজের বিধি-বিধান পরিপূর্ণরূপে পালন।

মানুষের সাথে সদাচারের বিষয়টি ব্যাপক। যেমন এর ব্যাপকতা প্রকাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَنْ تُعِيْنَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ، تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا وَتَدُلُّهُ عَلَى الطَّرِيْقِ، كُلُّ ذَلِكَ صَدَقَةٌ»

‘তুমি মানুষকে তার বাহনে চড়তে সাহায্য করবে, তাকে তাতে উঠিয়ে দেবে এবং পথ দেখিয়ে দেবে- এসবই সাদাকা।’[11] ইবন উমর রা. বলতেন,

«البرُّ شيءٌ هيّنٌ : وجهٌ طليقٌ وكلامٌ ليِّنٌ.

‘নেক কাজ অনেক সহজ : হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আর নরম বাক্য।’[12]

হজ মৌসুমে যেহেতু পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বিচিত্র স্বভাব ও বিভিন্ন পরিবেশের লোক সমবেত হয়। তাই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা এসব বৈচিত্র্য ও ব্যবধান ঘুচিয়ে, সব ধরনের বিবাদ-ঝগড়া এড়িয়ে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের চেতনায় একাকার হবার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

‘হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এ মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।’[13]

সারকথা, সেটিই মাবরূর হজ, যাতে কল্যাণের পূর্ণ সমাহার ঘটে। পূর্ণ মাত্রায় যাতে আদায় করা হয় হজের সব রুকন, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব। উপরন্তু তাতে বিরত থাকা হয় সব ধরনের গুনাহ ও পাপাচার থেকে। বস্তুত যে ব্যক্তি সকল ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ হজ পুরোপুরিভাবে আদায় করবে, অবশ্যই সে এই পুণ্য সফরে পাপাচার থেকে বিরত থাকবে।’

আর একমাত্র জান্নাতই যেহেতু মাবরূর হজের প্রতিদান। তাই এ সফরে বের হয়ে যে এর সকল বিধি-বিধান সুচারুরূপে পালন করে হজ সম্পন্ন করে, সে প্রকৃতপক্ষে জান্নাত নিয়েই ফিরে আসে। মৃত্যুর পর জান্নাতই তার ঠিকানা। অতএব আল্লাহ তা‘আলা যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে এ নিয়ামত ও অনুগ্রহে ভূষিত করেন তার জন্য কিছুতেই সমীচীন নয় হেলায় এ নিয়ামত হাতছাড়া করা; হজের শিক্ষা বিরোধী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজকে এ মহা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা; বরং তার উচিত, যেকোনো মূল্যে এ নিয়ামত ধরে রাখা।

মুসলিম মাত্রেরই জানা উচিত, হজের জন্য মক্কা গমন আল্লাহর এক বিশেষ দান ও অনুগ্রহ। কেউ তার সম্পদগুণে, শরীরের শক্তিবলে, নিজের ক্ষমতা বা পদ বলে সেখানে গমন করতে পারে না। এ জন্যই তাফসীরকারগণ বলেছেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন এর প্রথম ভিত রাখেন; কা‘বা ঘর নির্মাণ করেন; তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কাছে ওহী পাঠান, ‘হে ইবরাহীম, তুমি মানবজাতিকে কা‘বায় আসতে আহবান জানাও। তিনি বললেন, হে আমার রব, আমার আওয়াজ আর কতদূর পৌঁছবে? তাদের সবার কাছে আমার দাওয়াত কীভাবে পৌঁছবে? আল্লাহ তা‘আলা বললেন, তোমার দায়িত্ব আহবান জানানো আর আমার দায়িত্ব তা পৌঁছে দেয়া। অতপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানান, ‘হে

মানব সম্প্রদায়, আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেছেন, অতএব তোমরা এর উদ্দেশ্যে আগমন করো।' এ কথায় অনাগতকালে যারা হজ করবে তারা সবাই লাব্বাইক বলেছে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তারা সবাই তাদের বাপ-দাদার পিঠ থেকে সাড়া দিয়েছে। যে একবার লাব্বাইক বলেছে, সে একবার হজ করবে। যে দু'বার লাব্বাইক বলেছে সে দু'বার হজ করবে। যে যতবার বলেছে তার ততবার হজ নসীব হবে।[14]

এজন্যই হাজী সাহেব যখন হজের কার্যাদির সূচনা করেন তখন তার শ্লোগান হয়, 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'। আভিধানিকভাবে লাব্বাইক অর্থ আহবানে সাড়া দেয়া, উত্তর দেয়া। কেউ যখন কাউকে ডাকে, তার উত্তরে বলে, লাব্বাইক, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায়, আমি এখানে আছি। আমি আপনার নির্দেশ পালনে প্রস্তুত। আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি ইত্যাদি। সুতরাং হাজী সাহেব যখন লাব্বাইক বলে হজের কার্যক্রম শুরু করেন, তখন তিনি মূলত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সে আহবানেই সাড়া দেন।

মোটকথা হজে যেতে পারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। প্রতিটি মানুষই জানে তার স্বগোত্রের বহু লোকের এ সৌভাগ্য হয়নি। অথচ তারা ধনে, জনে, শক্তিতে ও পদবিতে তার চেয়ে অনেক বড়। যদি তার ওপর আল্লাহর দয়া না হত তাহলে সে হজ করতে পারত না। কাউকে যদি এ সৌভাগ্যে ভূষিত করা হয়, তবে বুঝতে হবে তা কেবলই আল্লাহর দয়া। সুবহানাল্লাহ্! 'জান্নাতই মাবরূর হজের প্রতিদান!'

ফুটনোট

[1]. বুখারী : ৩৭৭১; মুসলিম : ৯৪৩১।

[2]. মুসলিম: ১০১৫।

[3]. সুনানে ইবন মাজাহ্: ২৮৯০।

[4]. মুস্তাদরাক : ১/১৭৭৮।

[5]. মুসান্নাফে আবদুর-রাযযাক : ৫/৮৮১৬।

[6]. মুসনাদে আহমদ: ৩/৩২৫, ৩৩৪।

[7]. সুনানে তিরমিযী : ৩/১৮৯।

[8]. আল-ইসতিযকার : ৪/১০৪।

[9]. আল-ইসতিযকার : ৪/১০৪।

[10]. আল-ইসতিযকার : ৪/১০৪।

[11]. ইবন খুযাইমাহ : ১৪৯৩।

[12]. ইবন রজব, জামেউল উলূম ওয়াল-হিকাম : ৩৯/৮।

[13]. বাকারা : ১৮৭।

[14]. নসবুর-রাআ : ৩/২৩।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7339

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন